# ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্ব
## (১৯৪৭-৪৮)

মুহাম্মদ লুৎফুল হক

ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্ব (১৯৪৭-৪৮)
মুহাম্মদ লুৎফুল হক

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০২৩

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য : ৬৫০ টাকা

---

Vasa Andoloner Prothom Porbo (1947-48) by Muhammad Lutful Haq Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market Kantabon Dhaka 1205 First Edition: September 2023
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 650 Taka RS: 650 US 30 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

**ISBN:** 978-984-97557-0-8

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

দিনাজপুরে ভাষা আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তি আমার শ্বশুর আবদুল হক, চাচাশ্বশুর শওকত আলী এবং ফুফাশ্বশুর মতিউর রহমান সহ সকল ভাষাসৈনিকের উদ্দেশে উৎসর্গ করলাম

# ভূমিকা

বাংলাদেশের সংগ্রাম-আন্দোলনের ইতিহাসে 'রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন' একটি উজ্জ্বল মাইলফলক। পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়েই বাঙালির জাতিসত্তা উজ্জীবিত হয় এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রযাত্রা শুরু হয়। আমার এই মতের মিল পাই ভাষাসৈনিক আব্দুল মতিনের বক্তব্যে। তিনি উল্লেখ করেছেন, 'আন্দোলনের এই দেশে ভাষা আন্দোলন সর্বপ্রধান বা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ বললে হয়তো অত্যুক্তি হবে না।'[১]

ভাষা আন্দোলন আমাদের জাতিসত্তা বিকাশে কী ভূমিকা বা প্রভাব রেখেছিল সে সম্পর্কে গবেষক এম এম আকাশ বলেন, 'ভাষা আন্দোলন নিয়ে এ পর্যন্ত বই, বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধ, অংশগ্রহণকারীদের স্মৃতিচারণ, পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ইত্যাদি যত রচনা লিখিত ও প্রকাশিত হয়েছে তার সংখ্যা বিপুল। সেসব লেখার সারাৎসার থেকে দুটি বড় মাপের সিদ্ধান্তে না এসে উপায় থাকে না। প্রথমটি হলো, ভাষা আন্দোলন সংগঠিত হওয়ার পশ্চাতে রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক নানাবিধ কারণের সম্মিলিত মিথস্ক্রিয়া কার্যকর ছিল। দ্বিতীয়টি হলো, এই ভূখণ্ডের মানুষজনের ভেতরে বাঙালি জাতিসত্তার উপলব্ধি প্রথম অঙ্কুরিত হয় এই ঘটনা থেকে কিংবা আরো যথার্থ হয় একথা বললে—বাঙালি জাতিসত্তার উপলব্ধি যে বঞ্চনার ইতিহাস থেকে এসেছিল তা-ই বিস্ফোরিত হয় ভাষা আন্দোলনে।'[২]

ভাষা আন্দোলন মূলত দুই পর্বে সংঘটিত হয়েছিল। প্রথম পর্ব ১৯৪৭ সালের আগস্ট থেকে ১৯৪৮ সালের এপ্রিল পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় পর্ব ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে।

কৌতূহলী মন কিশোর বয়স থেকেই এ আন্দোলন সম্পর্কে জানার চেষ্টা করতে থাকে। দীর্ঘ প্রায় পঞ্চাশ বছর এই আন্দোলন সম্পর্কে জানার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। পরিণত বয়সে এসে মনে হয়েছে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস সংরক্ষণে আমরা খুব একটা সচেতনতার পরিচয় দেইনি। ভাষা আন্দোলন নিয়ে অনেক বই রচিত হলেও অধিকাংশই স্মৃতিকথা বা সাধারণ মানের বর্ণনামূলক বই। আবার বেশিরভাগ স্মৃতিকথাই ঘটনার দশ-পনেরো বা আরও অধিক সময় পরে লেখা হয়েছে। ফলে কিছু তথ্য বিভ্রাট, বিতর্ক ও অসামঞ্জস্য লক্ষ করা যায়। এছাড়া কখনো কখনো স্মৃতিকথায় লেখকের আমিত্ব ও রাজনৈতিক আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে প্রকটভাবে। এসব বই গুরুত্বহীন নয়, বরং এগুলো থেকে আমরা ভাষা আন্দোলনের অনেক তথ্য

পাই। তবে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে ভাষা আন্দোলন নিয়ে ভালো বা গবেষণামূলক বইয়ের সংখ্যা হাতে গোনা যায়। পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার জন্য আরও গবেষণালব্ধ বইয়ের প্রয়োজন ছিল। এই প্রয়োজনীয়তাই আমাকে এই বই রচনায় উদ্বুদ্ধ করে।

প্রাথমিকভাবে আমি ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্বের ইতিহাস রচনায় হাত দেই। প্রথমেই হোঁচট খাই আন্দোলন সংক্রান্ত নথি সংগ্রহের ক্ষেত্রে। লক্ষ করি যে, ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস রচনার মৌলিক উপাদান অর্থাৎ সরকারি বা বেসরকারি নথি এবং পত্র-পত্রিকার কোনো সংগ্রহ কোথাও সংরক্ষিত হয়নি। এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৪৭-৪৮ সালে আজকের বাংলাদেশ থেকে কোনো দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হতো না। স্বভাবত দৈনিক পত্রিকার অভাবে ভাষা আন্দোলনের প্রতিদিনের সংবাদ লীপিবদ্ধ হয়নি। এছাড়া দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যে সমস্ত সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হতো, তাও কোথাও সংগৃহীত নাই। ধারণা করা যায় যে এ সমস্ত পত্রিকায় স্থানীয়ভাবে গড়ে ওঠা আন্দোলনের তথ্য প্রকাশিত হয়েছিল। তথাপিও ঢাকা ও প্রদেশের আনাচে কানাচে গড়ে ওঠা আন্দোলন নিয়ে বেশ কিছু স্মৃতিকথা বা স্থানীয় ইতিহাসের বই বা রচনা পাওয়া যায়। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এ সমস্ত বই ও রচনায় যে তথ্য পাওয়া যায় তাতে সূত্রের অভাবে গ্রহণযোগ্যতা বা বিশ্বাসযোগ্যতার ঘাটতি থেকে গেছে। ঘটনার সত্তর বছর পর এ সমস্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই আন্দোলনের ইতিহাস রচনা বেশ দুরূহ হয়ে উঠেছে। এ কারণে ইতিহাস রচনার আগে এর উপাদানগুলো একত্র করার উদ্যোগ নিই। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নথিগুলোকে যতটা সম্ভব একত্র করার চেষ্টা করি।

বর্তমানে প্রথম পর্বের ইতিহাস রচনায় হাত দিয়েছি। তবে আহরিত তথ্য ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে ইতিহাসে রূপান্তরে সময়ের প্রয়োজন হবে, তাই সংগৃহীত নথি আবদ্ধ না রেখে প্রকাশ করাই শ্রেয় মনে করছি। ধারণা করি এসব নথি ও তথ্য গবেষক ও ইতিহাসবিদদের উপকারে আসবে।

এই বই রচনায় সবচেয়ে বেশি অনুপ্রেরণা ও সাহস জুগিয়েছে গবেষক বদরুদ্দীন উমর রচিত ভাষা আন্দোলনের ওপর বেশ কয়েকটি বই এবং গবেষক বশীর আল হেলালের 'ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস'। এছাড়া বাংলা একাডেমি প্রকাশিত কয়েকটি বইয়েরও সাহায্য পেয়েছি। বাংলা একাডেমি প্রকাশিত কিছু স্মৃতিকথার সাহায্য পেলে আরও উপকার হতো, তবে তা বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগারেও সংরক্ষিত নেই। এই বইগুলো থেকে আমি প্রচুর তথ্য আহরণ করেছি। তবে আমার বইয়ের জন্য তথ্য সংগ্রহের মূল উৎস হচ্ছে তৎকালীন দৈনিক পত্রিকাসমূহ। আমি ঢাকা ও কলকাতার বেশ কয়েকটি গ্রন্থাগার ও অভিলেখাগার থেকে সে সময়ের দৈনিক *আজাদ*, দৈনিক *যুগান্তর*, দৈনিক *আনন্দবাজার পত্রিকা*, দৈনিক *অমৃতবাজার পত্রিকা*, দৈনিক *ডন* ইত্যাদি পত্রিকায় প্রকাশিত প্রথম পর্বের ভাষা আন্দোলন সংশ্লিষ্ট প্রায় সকল সংবাদ সংগ্রহ করি। এ সমস্ত মৌলিক তথ্যের পাশাপাশি আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের

স্মৃতিকথা থেকেও তথ্য সংকলিত করেছি। তবে এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে যে তখনকার দৈনিক পত্রিকার ধারা অনুযায়ী, সংবাদের কলেবর খুব সংক্ষিপ্ত হতো, ফলে সব তথ্য পাওয়া যেত না। কয়েকটি দৈনিকের সংবাদ একত্র করে বিভিন্ন ঘটনার পূর্ণতা আনার চেষ্টা করেছি।

গ্রহণযোগ্যতা তথা বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণের জন্য বইয়ে বেশ কিছু সংবাদ ও নথির ইমেজ যুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া সে সময়ের কয়েকটি কার্টুনও ছাপানো হয়েছে যা পূর্বে বাংলাদেশের কোনো বইয়ে প্রকাশিত হয়নি। ওপেন সোর্স বা গুগলে পাওয়া ভাষা আন্দোলনের কয়েকটি ছবিও বইয়ে যুক্ত করা হয়েছে।

বইয়ে যতটা সম্ভব নথি ও তথ্য অপরিবর্তিত রেখে সংযুক্ত করেছি, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বিশেষ কিছু করি নাই।

বইয়ে ভাষা আন্দোলনের তথ্যসমূহ মূলত সময়ের ধারাবাহিকতায় উপস্থাপন করা হয়েছে, তবে কোনো একটি ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রে সেই ঘটনার নিজস্ব সময়ক্রমে তা লেখা হয়েছে।

বইয়ের জন্য তথ্য সংগ্রহ করে, সেগুলোকে বাছাই, কম্পোজ করা থেকে শুরু করে সকল পর্যায়ে আমাকে সহযোগিতা করার জন্য সরদার আবদুল মতিন, আবুল খায়ের, মেহবুবা খানম, সাদিয়া শারমীন ঠাকুর, রিদওয়ানা আশরাফী, সালমা বিনতে সালেহ, দিনেশ চন্দ্র মাহাতো এবং তৌফিকুল ইসলামের কাছে কৃতজ্ঞ থেকে গেলাম।

## পূর্বকথা

১৯৪৭ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী রিচার্ড এ্যাটলি ঘোষণা দেন যে, ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেয়া হবে। একই বছরের জুন মাসে ভারতের মূল রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে ব্রিটিশ ভারতের শেষ ভাইসরয় লর্ড লুই মাউন্টব্যাটন সিদ্ধান্ত দেন যে ১৯৪৮ সাল নয়, বরং ১৫ আগস্টের মধ্যেই ভারতবর্ষ ভেঙে পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি পৃথক রাষ্ট্র জন্ম নেবে। জুলাই মাসে ইংল্যান্ডের রাজা ষষ্ঠ জর্জ ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ডিক্রি স্বাক্ষর করেন। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট ভারতবর্ষের বেশকিছু মুসলমান অধ্যুষিত এলাকা নিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। আর বাকি এলাকা নিয়ে গঠিত হয় ভারত। অবিভক্ত বাংলার পূর্বাঞ্চল বা পূর্ববাংলা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা হওয়ায় তা পাকিস্তানের অংশ হিসেবে স্বাধীন হয় এবং একটি প্রদেশের মর্যদা লাভ করে। প্রাথমিকভাবে প্রদেশের নাম পূর্ববাংলা অপরিবর্তিত রাখা হয়। পরে, ১৯৫৮ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে এটির নামকরণ করা হয় পূর্ব পাকিস্তান। তবে দেশভাগের পর থেকেই অনানুষ্ঠানিকভাবে অনেক ক্ষেত্রে এটিকে পূর্ব পাকিস্তান বলা হতো। এছাড়া এটিকে আগে থেকে পূর্ববঙ্গ নামেও অবিহিত করা হতো। এ সময়ে পূর্ববাংলার জনসংখ্যা ছিল প্রায় চার কোটি, যা পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫৮ ভাগ। পূর্ববাংলার নিরানব্বই শতাংশ মানুষেরই মাতৃভাষা ছিল বাংলা।

স্বাধীনতার প্রাক্কালে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা, গণপরিষদের ভাষা, বিভিন্ন প্রদেশে দাপ্তরিক ও শিক্ষার ভাষা ইত্যাদি প্রসঙ্গে চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত না হলেও স্বাধীনতার বেশ আগে থেকেই একটা ধারণা প্রচলিত ছিল যে উর্দুই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হতে যাচ্ছে, আর অন্যান্য পর্যায়ে ভাষার সিদ্ধান্ত পরবর্তীতে নেয়া হবে। সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির গুরুত্বপূর্ণ সদস্য চৌধুরী খালেকুজ্জামানের (১৮৮৯-১৯৭৩) বরাতে ১৯৪৭ সালের ১৯ মে-এর *আজাদ* পত্রিকায় প্রকাশ পায়, 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য চৌধুরী খালেকুজ্জামান মজলিস-এ-"ইত্তেহাদুল মুসলেমিনের" বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত উর্দু সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ প্রদান প্রসঙ্গে ঘোষনা করেন "উর্দুই পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা হইবে"।'[৩] এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে যে মুসলিম লীগের নেতৃত্বে পাকিস্তানের স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল, স্বভাবত নতুন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষাসহ নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে তারাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করছিলেন।

পাকিস্তান আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত বাঙালি নেতৃবৃন্দ এ সময়ে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা হিসেবে বাংলাকে একক বা উর্দুর সঙ্গে যৌথভাবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা নির্ধারণের চিন্তা করেননি। বরং অধিকাংশ বাঙালি নেতাই উর্দুকে এককভাবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণের পরিকল্পনায় সমর্থন করেন অথবা কোনো আপত্তি জানাননি। তবে পূর্ববাংলার নেতাদের একটি বড় অংশ বাংলাকে পূর্ববাংলার দাপ্তরিক ভাষা, বিচারিক ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে দেখতে আগ্রহী থাকলেও মুসলিম লীগের মুষ্টিমেয় কিছু নেতা উর্দুকে পূর্ববাংলার দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে দেখতে চান। ফলশ্রুতিতে পূর্ববাংলার দাপ্তরিক ভাষা বাংলা না উর্দু হবে, নাকি অন্য কোনো ভাষা হবে; শিক্ষার মাধ্যমই বা কী হবে তা নিয়ে ১৯৪৭ সালের মাঝামাঝি থেকে আলোচনার সূত্রপাত হয়। প্রাথমিকভাবে এ সমস্ত মতামত বা বিতর্ক বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ঢাকা ও কলকাতার শিক্ষিত সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তাদের বক্তব্য, বিবৃতি ও বিতর্কের সংবাদ কখনো কখনো পত্রিকা বা সাময়িকীতে প্রকাশ পেলেও বিষয়টি পূর্ববাংলার সাধারণ মানুষের আগ্রহের বস্তুতে রূপ নেয়নি।

সময়টা ছিল পাকিস্তানের জন্মলাভের মুহূর্ত, আর তা ছিল বাঙালিসহ ভারতবর্ষের মুসলমানদের দীর্ঘদিনের চাহিদা। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য তাদেরকে প্রচুর সংগ্রাম ও ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছিল। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়টা ছিল এই ত্যাগের ফল ভোগ করার সময়। ঠিক সেই মুহূর্তে বাংলা ভাষা পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বা পূর্ববাংলার দাপ্তরিক ভাষা হবে কি হবে না, তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার সময় অনেকেরই ছিল না। উপরন্তু এ সময় হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যকার সম্পর্কের মধ্যেও একটা টানাপোড়েন চলছিল। ফলশ্রুতিতে, লাখ লাখ মানুষ দেশত্যাগ করে উদ্বাস্তু হয়ে পড়ে এবং সেটাই ছিল সে সময়ে সবচেয়ে বড় সমস্যা। এছাড়া জনগণ প্রতিনিয়ত খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোসহ আরও অনেক বিষয়ে সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছিল। ফলে স্বাধীনতার প্রাক্কালে ভাষার প্রশ্নটি অগ্রগন্যতার বিচারে বেশ পিছনে ছিল। সে সময়ের পরিস্থিতি বর্ণনা করতে গিয়ে গবেষক বশীর আল হেলাল (১৯৩৬-২০২১) উল্লেখ করেন, 'এখানে একটা কথা বলে নেয়া দরকার। ভাষা-আন্দোলন সম্পর্কে যাঁরা কিছু লিখেছেন বা স্মৃতিচারণ করেছেন তাঁদের অনেকেই একটা কথা বলেছেন যে, ১৯৪৮ সালের মার্চের আগে ঠিক আন্দোলন বলতে যা বোঝায় বাংলাভাষার পক্ষে তা এমন কিছু হয়নি, ১৯৪৮ সালের গোড়ার দিকেই প্রথম ছাত্ররা সে-আন্দোলনকে বাস্তব রূপ দেয় এবং সে-সময় ছাত্রদের মাত্র সামান্য অংশের মধ্যে বাংলাভাষা সম্পর্কে সচেতনতা ছিল, ছাত্র এবং বুদ্ধিজীবীদের বৃহত্তর অংশের মধ্যে উর্দুর পক্ষেই মনোভাব ছিল, সাধারণ মানুষের তো এই নিয়ে চিন্তা করার অবকাশই ছিল না।'[৪] এ বিষয়ে ভাষা আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক অধ্যাপক ড. এ এস এম নুরুল হক ভুঁইয়াও (১৯২৩-১৯৯৮) একই রকম বর্ণনা দেন। তিনি উল্লেখ করেন, 'একেবারে প্রথম দিকে তো রাষ্ট্রভাষা যে বাংলা হতে পারে এ ব্যাপারটি যেন অনেকে বুঝতেই চাননি। এর গুরুত্ব অনুভব করেননি।

ইউনিভার্সিটির কয়েকজন সায়েন্সের অধ্যাপক ছাড়া এ ব্যাপারে কেউ এগিয়ে আসার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেননি। বাংলা ডিপার্টমেন্ট তো রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে চরম নির্লিপ্ত ভূমিকা পালন করে। ... প্রথম দিকে রাষ্ট্রভাষা বাংলার প্রশ্নটি নিয়ে ইউনির্ভাসিটি ক্যাম্পাসে আমাদের রীতিমত নাজেহাল হতে হয়েছে।

ক্যাম্পাসে যাঁদের সাথে ভাষা সম্পর্কে আলোচনা করে তখন সাড়া পাওয়া গেছে তাঁদের মধ্যে ফজলুল হক হলের প্রভোষ্ট ডঃ মাহমুদ হোসেন (পরে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর হন), অধ্যাপক রেআয়ৎ খাঁ, সরদার ফজলুল করিম, আজিজ আহমদ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। রেআয়ৎ খাঁ অবাঙ্গালী ছিলেন। তিনি প্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটিরও (পরিষদ) সদস্য ছিলেন। ডঃ মাহমুদ হোসেন ও রেআয়ৎ খাঁ রাষ্ট্রভাষা বাংলার মুখর সমর্থক ছিলেন। রেআয়ৎ খাঁ বলতেন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ সারা পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠ। সুতরাং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী ন্যায্য এবং স্বাভাবিক।'[৫]

বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীও ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্বে খুব একটা আগ্রহ দেখাননি। কেউ কেউ সদ্য স্বাধীনতা পাওয়া পাকিস্তানের জন্য এই আন্দোলন রাষ্ট্রদ্রোহিতা বা অসময়োপযোগী বলে মত দেন। এই বিষয়ে ভাষা আন্দোলনের অপর অন্যতম সংগঠক অধ্যাপক আবুল কাসেম (১৯২০-১৯৯১) উল্লেখ করেন, 'এ আন্দোলনকে সমর্থন ও সাহায্য করবার জন্য আমরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছে যাই। কিন্তু লীগ, কংগ্রেস, কমিউনিস্ট পার্টি, ছাত্র ফেডারেশন (তখনকার বামপন্থী ছাত্র প্রতিষ্ঠান)—এদের প্রত্যেকে আমাদের নিরাশ করে ফিরিয়ে দেয়। মুসলিম লীগ একে মোটেই আমল দেয়নি। কংগ্রেস নেতা কর্মীরা তো ভাষা আন্দোলনের নাম শুনে আঁতকে ওঠেন। ঢাকা জজ কোর্টের পিছনে তখন কমিউনিস্ট পার্টির বিরাট অফিস ছিল। একদিন কমরেড মুজাফফর আহমদের সভাপতিত্বে পার্টির মিটিং চলাকালে ভাষা আন্দোলনের পক্ষে সমর্থন আদায়ের জন্য আমরা রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের কয়েকজন কর্মীসহ সেখানে উপস্থিত হই। আমাদের বক্তব্য শুনে তিনি পার্টির পক্ষ হতে জানিয়ে দেন : এই আন্দোলনকে সমর্থন করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়, তিনি রাষ্ট্রভাষার দাবি সম্বলিত স্মারকলিপিতে দস্তখত করতেও অস্বীকার করেন। ছাত্র ফেডারেশনও এতে যোগদান করতে অস্বীকার করে।'[৬]

তারপরও এ সমস্ত প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উঠে, এ সময় থেকেই বাংলা ভাষাকে জাতীয় বা প্রাদেশিক পর্যায়ে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য ধীরগতিতে প্রথমে ব্যক্তি পর্যায়ে বক্তব্য বা বিবৃতি প্রদান, পরবর্তীতে সামষ্টিক আবেদন এবং এরপরে সভা-সমাবেশে দাবির মাধ্যমে আন্দোলনের ক্ষেত্র তৈরি হতে থাকে। এ সময়ে রাষ্ট্রভাষার জন্য আবেদন বা দাবি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আরও অনেক দাবির মধ্যে একটি হিসেবে উপস্থাপন করা হতো। দাবি ও আন্দোলনের ক্ষেত্রে রাজধানী ঢাকা এগিয়ে থাকলেও, ধীরগতিতে এর ব্যাপ্তি প্রদেশের অন্যান্য এলাকায়ও ছড়িয়ে পড়তে থাকে। পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পর থেকে বাংলা ভাষার স্বপক্ষে বিবৃতি, বক্তব্য ও দাবি সময়ের ব্যবধানে কীভাবে আন্দোলনে রূপ নিল তা নিচে বর্ণিত হলো।

**আবদুল হকের প্রস্তাব**

আবদুল হক (১৯১৮-১৯৯৭) ছিলেন একজন প্রাবন্ধিক ও চিন্তক। ১৯৪৭ সালের জুন মাস থেকে রাষ্ট্রভাষা বিষয়ে তিনি বেশ কয়েকটি রচনা বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধগুলো রচনার অনিবার্যতা প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন, 'ভারত-বিভাগ পরিকল্পনা ঘোষণার পর হিসাব করে দেখা গেল পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাঙালিরাই সংখ্যাগুরু হতে যাচ্ছে। এই ব্যাপারটি বাঙালি মুসলিম-মানসে এক ধরনের আস্থা সৃষ্টি করেছিল। ভাবী রাষ্ট্রের বিভিন্ন সম্ভাবনা নিয়ে অনেক রোমান্টিক জল্পনা। সে জল্পনার মধ্যে বাঙালি মুসলমানদের অনেক রঙিন স্বপ্নও মেশানো ছিল। সেই সময়ে কবি আবুল হোসেন (১৯২২-২০১৪) একদিন বললেন, পশ্চিমারা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করতে যাচ্ছে, এই প্রয়াসের প্রতিরোধ দরকার। এ বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ ছিল না। সংবাদপত্রেও এই প্রয়াসের সংবাদ প্রকাশিত হল। বাঙালিদের দিক থেকে দেখতে গেলে, পাকিস্তানের রঙিন জল্পনার উপর এই ছিল প্রথম আঘাত। কবি ফররুখ আহমদকে (১৯১৮-১৯৭৪) একথা বললাম; কথা হল আমরা বাংলা রাষ্ট্রভাষার সপক্ষে লিখব এবং ব্যক্তিগত পর্যায়েও প্রচারণা চালাব। ...

বাংলা রাষ্টভাষার সপক্ষে লেখা সেই সময়ে আমি একটা অবশ্যকরণীয় কর্তব্য হিসাবে গ্রহণ করেছিলাম। পর-পর চারটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম।'[৭]

বাংলা ভাষার স্বপক্ষে আবদুল হকের লেখনী সম্পর্কে প্রফেসর আনিসুজ্জামান (১৯৩৭-২০২০) বলেন, 'তার [লর্ড মাউন্টব্যাটন] এ ঘোষণার [ভারত বিভক্তির] পরে কলকাতার মুসলমান লেখক ও সাংবাদিকদের কয়েকজন *আজাদ* ও *ইত্তেহাদ* পত্রিকায় পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। এক্ষেত্রে আগ্রহী ছিলেন প্রাবন্ধিক আবদুল হক, তবে বিষয়টির প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন কবি আবুল হোসেন এবং তাঁর রচনা প্রকাশে সাহায্য করেন কবি আহসান হাবীব (১৯১৭-১৯৮৫)।'[৮]

আবদুল হক 'বাংলা ভাষা বিষয়ক প্রস্তাব' শিরোনামে তার প্রথম নিবন্ধটি ১৯৪৭ সালের ২২ ও ২৯ জুন কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক *ইত্তেহাদ* পত্রিকায় প্রকাশ করেন। নিবন্ধে তিনি উল্লেখ করেন যে বাঙালির মধ্যে নিজস্ব ভাষার বিষয়ে একধরনের হীনম্মন্যতা লক্ষ করা যায়, যাকে তিনি বাঙালির ইংরেজিয়ানা উল্লেখ করেন, যার কোন যুক্তি তিনি খুঁজে পাননি। তাই তিনি এই হীনম্মন্যতা ঝেড়ে ফেলে বাংলাকে যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রবন্ধে জোরালো বক্তব্য উপস্থাপন করেন। ২৯ জুনে প্রকাশিত প্রবন্ধের শেষে তিনি উল্লেখ করেন, 'আমার মনে একটা প্রশ্ন সব সময়ে উদ্যত হয়ে থাকে : আমরা কেন আমাদের দেশে ইংরেজি-উর্দু-হিন্দি বলতে বাধ্য থাকব? আমাদের দেশে যারা বাস করে সেইসব ইংরেজ বা উর্দু-হিন্দিভাষীরা কেন বাংলা শিখতে বাধ্য হবে না? আমার মত এই যে, এদেশে যেসব অভারতীয় অথবা অবাঙালি বাস করবে, তাদের বাংলা শিখতে হবে, যদি তারা এদেশে বাস করতে চায় এবং আমাদের সঙ্গে চলতে চায়। বাংলা শেখা তাদেরই গরজ। তাদের জন্য ইংরেজি-উর্দু-হিন্দি শেখা আমাদের গরজ নয়, বরং আমাদের পক্ষে ঘোর

অমর্যাদাকর। আন্তর্জাতিক সম্বন্ধের জন্য এবং আন্তর্জাতিক সাহিত্য-সংযোগের জন্য যতটুকু ইংরেজি-উর্দু-হিন্দি শেখা দরকার, শুধু ততটুকুই আমরা শিখব এবং অন্ততঃ ততটুকু বাংলা পৃথিবীর জাতিপুঞ্জকেও শিখতে হবে। ভারতের অন্য অঞ্চলে যেয়ে যেমন সে-অঞ্চলের এবং ভারতের বাইরে যেয়ে যেমন সেখানকার ভাষা ব্যবহার না করে আমাদের গত্যন্তর নেই, তেমনি ভারতের অন্য অঞ্চলের এবং ভারতের বাইরেকার দেশের লোকদের বাংলায় এসে, বাংলা ভাষা ব্যবহার না করে গত্যন্তর না থাকা উচিত। তাতেই প্রকৃত জাতীয় মর্যাদা এবং অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব।'[৯]

এরপর ৩০ জুন তিনি কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক *আজাদ* পত্রিকায় 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। প্রবন্ধে তিনি সুনির্দিষ্টভাবে বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের একক রাষ্ট্রভাষা নির্ধারণের পক্ষে মত দেন। বাংলাকে এককভাবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার জন্য ব্যক্তিপর্যায়ে এটাই প্রথম দাবি বলে ধারণা করা যায়। তিনি প্রবন্ধে উল্লেখ করেন, 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হবে, তা এখন স্থির করার সময় এসেছে। যে ভাষাকেই আমরা রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করি, তার আগে আমাদের বিশেষভাবে ভেবে দেখতে হবে, কোন ভাষাকে রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করলে সব থেকে বেশি সুবিধা হবে, কোন ভাষায় পাকিস্তানের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক লোক কথা বলে, পাকিস্তানের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ভাষা কোনটি, কোন ভাষায় সব থেকে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে, এবং কোন ভাষা ভাব প্রকাশের পক্ষে সব থেকে বেশি উপযোগী। যেদিক থেকেই বিবেচনা করা যাক না কেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলা ভাষার দাবিই সবচেয়ে বেশি। এর মধ্যে দ্ব্যর্থক যদিও কিছু নেই, তবু এখানে স্পষ্ট করেই বলা প্রয়োজন বোধ করছি যে, কেবল পূর্ব-পাকিস্তানের জন্যই নয়, পশ্চিম-পাকিস্তানসহ সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়ার দাবি এবং যোগ্যতা সবচেয়ে বেশি বাংলা ভাষার।

পাকিস্তানের সবচেয়ে বেশি প্রচলিত ভাষা পাঁচটি : বেলুচী, পশতু, সিন্ধী, পাঞ্জাবী এবং বাংলা। পশ্চিম-পাকিস্তানে উর্দুভাষা নেই তা নয়, বাংলায়ও আছে। কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তানের তো নয়ই, পশ্চিম-পাকিস্তানেরও কোনো প্রদেশের মাতৃভাষা উর্দু নয়।

পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা নির্বাচন করতে হলে এই পাঁচটি ভাষার মধ্য থেকেই করতে হবে। এর মধ্যে প্রথম চারটি ভাষায় যাঁরা কথা বলেন, তাঁদের কারোই সংখ্যা বাংলাভাষীদের সমান নয়। পশতুভাষীদের সংখ্যা ১ কোটির অনেক নিচে। বেলুচী এবং সিন্ধীভাষীদের সংখ্যা তার চেয়েও কম। সবচেয়ে বেশিসংখ্যক লোক কথা বলে পাঞ্জাবীতে। কিন্তু ভাষা হিসাবে এগুলোর কোনটিই প্রথম শ্রেণীর পর্যায়ে পড়ে না। এসব ভাষায় কোনো উন্নত সাহিত্য গড়ে উঠেনি। অতএব এসব ভাষাকে রাষ্ট্রভাষিক প্রশ্ন থেকে বাদ দেওয়া যায়।

বাকি থাকে বাংলা। আমাদের যে 'বিকলাঙ্গ' পূর্ব-পাকিস্তান, সে পাকিস্তানেও বাংলাভাষীর সংখ্যা পাঁচ কোটির মতো [দেশভাগের সীমানা তখনও সুনির্দ্দিষ্ট না হওয়ায় জনসংখ্যা বেশী উল্লেখ করা হয়েছে]। সিলেটের গণভোটে আমাদের জয়

হলে এবং সীমা-নির্ধারণ কমিশনের রায়ের ফলে আপাত-নির্দিষ্ট পূর্ব-পাকিস্তানের সংলগ্ন মুসলিম-প্রধান অঞ্চলগুলো এর সঙ্গে সংযুক্ত হলে পূর্ব পাকিস্তানের লোকসংখ্যা দাঁড়াবে পাঁচ কোটির কিছু বেশি। এই পাঁচ কোটির প্রায় সকলেই বাংলাভাষী। ...

পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হবে তা এখনও কেউ বলতে পারেন না, কিন্তু কোন ভাষা রাষ্ট্রভাষা হতে পারে তা বলবার অধিকার সকলেরই আছে এবং কোন ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণ করলে ফলাফল কীরূপ হবে, তাও বলবার অধিকার সকলেরই আছে। আশা করি এ সম্বন্ধে কার কী মতামত তা জানতে পারব।

আরো একটি কথা সত্য যে, পূর্ব-পাকিস্তানের পাঁচ কোটি লোকের অন্তরকে যদি জানতে হয়, তবে পশ্চিম-পাকিস্তানের নাগরিকগণকে পূর্ব-পাকিস্তানের ভাষা ও সাহিত্যকে বাধ্যতামূলকভাবে জানতে হবেই। এক অংশের নাগরিক যদি অন্য অংশের নাগরিকদের না বুঝেন, তবে এক রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত থাকার অর্থ কিছুই থাকে না। অতএব, পূর্ব-পাকিস্তানকে অন্তরঙ্গভাবে জানতে হলে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন করা পশ্চিম-পাকিস্তানের প্রত্যেক নাগরিকেরই অবশ্য-কর্তব্য এবং বাধ্যতামূলক কর্তব্যরূপে গণ্য না হয়ে পারে না। তাই যদি হয়, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যই যদি তাঁদের অধ্যয়ন করতে হয়, তবে পশ্চিম-পাকিস্তানেরও রাষ্ট্রভাষারূপে বাংলাকে গ্রহণ করতে আপত্তি কী? পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা যে বাংলা হবে, এতে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। পশ্চিম-পাকিস্তানেরও রাষ্ট্রভাষা বাংলা হলে শুধু তিন কোটি লোককে নূতন ভাষা শিখতে হয়, কিন্তু উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করলে প্রায় আট কোটি লোককেই নতুন একটা ভাষা শিখতে হবে।'[১০]

*অমৃতবাজার পত্রিকা*। ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭।

পূর্বে উল্লেখ করেছি যে পাকিস্তানের স্বাধীনতার কিছু আগে থেকেই উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার তোড়জোড় শুরু হয়ে যায়। এই প্রেক্ষিতে আবদুল হক ২৭ জুলাই দৈনিক *ইত্তেহাদ* পত্রিকায় 'উর্দু রাষ্ট্রভাষা হলে' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। সেখানে ৩০ জুনে দৈনিক *আজাদ*-এ প্রকাশিত প্রবন্ধের কিছু বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এই প্রবন্ধে বাংলা ভাষায় পৌত্তলিকতার প্রভাব আছে বলে যে অভিযোগ করা হতো তা তিনি খণ্ডন করেন। তিনি তুলে ধরেন যে বাংলা ভাষা হিন্দুর ভাষা নয়। হিন্দু-মুসলমানের মিলিত ভাষা এবং বাঙালি হিন্দুর চেয়ে বাঙালি মুসলমানের সংখ্যাই বেশি। উর্দু রাষ্ট্রভাষা হলে পূর্ববাংলার জনসাধারণ ও বাংলা ভাষার কী দুর্গতি হবে, প্রবন্ধে তিনি তা বোঝানোর চেষ্টা করেন। তিনি উল্লেখ করেন, 'পূর্ণ এবং সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা না পেলে স্বাধীনতার সার্থকতা সামান্যই। সেরূপ স্বাধীনতা আমাদের পেতে হবে। এর অর্থ এই যে, ভাষাগত স্বাধীনতাও আমাদের পাওয়া চাই। ভাষাগত স্বাধীনতা না পেলে বন্ধ-মুখ অবস্থাতেই স্বাধীনতা পাওয়া হবে। অতএব আমাদের রাষ্ট্রভাষা হবে বাংলা। পাকিস্তানের আট কোটি লোকের পাঁচ কোটি লোকে কথা বলে বাংলা ভাষায়। পাকিস্তানের সর্বাপেক্ষা বর্ধিষ্ণু, প্রগতিশীল এবং উন্নত ভাষা হচ্ছে বাংলা। অতএব আমাদের রাষ্ট্রভাষা যে বাংলা ছাড়া আর কিছু হতে পারে না সে বিষয়ে কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না।

তবু লক্ষ্য করেছি যে, কোনো কোনো লোকের ইচ্ছা উর্দু রাষ্ট্রভাষা হোক। পশ্চিম-পাকিস্তানের অধিবাসী বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে সামান্যই জানেন, অতএব তাঁরা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার কথা বলতে পারেন। কিন্তু বাংলার লোক যে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার কথা বলবেন এটা আশ্চর্যজনক। ...

পূর্ব-পাকিস্তানের অধিবাসীরা আজ স্বাধীন হতে যাচ্ছে। স্বাধীন হওয়ার ফলে তাদের শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক পশ্চাদপদতা দূর হবে, সাহিত্য-ক্ষেত্রে তারা দ্রুত অগ্রসর হবে এবং যেহেতু ঐ অঞ্চলে মুসলমান সংখ্যাগুরু এই কারণে বাংলা সাহিত্য মুসলিম সংস্কৃতিরও বাহন হয়ে উঠবে। অতএব মুসলিম সংস্কৃতির ভাষাগত এলাকা পূর্বাপেক্ষা বিস্তৃততর হবে।

উর্দু রাষ্ট্রভাষা হলে তা' হবে না। সাহিত্যক্ষেত্রে আমরা বর্তমানে যেরূপ পশ্চাদপদ আছি, ভবিষ্যতে তার চেয়েও বেশি পশ্চাদপদ হয়ে পড়ব। উর্দু রাষ্ট্রভাষা হলে বাংলা সাহিত্যের অপেক্ষা উর্দু সাহিত্যের পাঠকসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং তার ফলে লেখক-সম্প্রদায় বাংলা অপেক্ষা উর্দুতেই সাহিত্য-চর্চায় অধিকতর মনোযোগী হবেন। ইংরেজি ভাষার পাঠকসংখ্যা বেশি হওয়ায় যদুনাথ সরকার, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রমুখ লেখকগণ ইতিহাস দর্শন ইত্যাদি লিখলেন ইংরেজিতে। তার ফলে বাংলা সাহিত্য ক্ষতিগ্রস্ত হলো। উর্দু রাষ্ট্রভাষা হলেও বাংলা সাহিত্য তেমনি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

তারপর উর্দু আমাদের মাতৃভাষা নয়। অতএব আমরা যতই মনে-প্রাণে উর্দু সাহিত্যের চর্চা করি না কেন, উর্দুভাষীদের মতো উৎকর্ষের অধিকারী আমরা কখনই হতে পারব না, আমরা চিরদিন পশ্চাদপদ হয়ে রইব।...

পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা স্থির করার সময় ভাষাতাত্ত্বিকদের অভিমত নিতে হবে। একটা রাষ্ট্রের সব কাজই রাজনৈতিক নেতাদের দ্বারা হতে পারে না। রণনীতি নির্ধারণের জন্য যেমন রণবিশারদের অভিমত নেওয়া প্রয়োজন, শিক্ষা-ব্যবস্থার জন্য যেমন শিক্ষাবিদের, অর্থনীতির জন্য যেমন অর্থনীতিবিদের, তেমনি পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা স্থির করার জন্য তাঁদের অভিমত নিতে হবে, যাঁরা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করেন। এ বিষয়ে শুধু রাজনীতিকদের অভিমত গ্রহণীয় হতে পারে না। সব বিষয়েই তাঁরা বিশারদ নন।'[১১]

১৯৪৭ সালে ২৭ জুলাই আবদুল হক কলকাতা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক *বেগম* পত্রিকায় মিসেস এম. এ. হক ছদ্মনাম বা পেননেমে 'পূর্ব্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা' শীর্ষক অপর একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। প্রবন্ধটি মূলত মহিলাদের উদ্দেশে রচিত। এই প্রবন্ধের সাহায্যে তিনি বাঙালি নারীদের ভাষার অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলন করার আহ্বান জানান। তিনি প্রবন্ধে উল্লেখ করেন, 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হইবে, তা লইয়া বিভিন্ন পত্রিকায় আলোচনা হইতেছে। কেহ বলিতেছেন, রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত বাংলা, কেহ বলিতেছেন উর্দু, আবার কেহ ইংরাজীর কথাও বলিতেছেন।...সমগ্র পাকিস্তানের তিনভাগের প্রায় দুই ভাগ অধিবাসী পূর্ব্ব পাকিস্তানে বাস করে, এবং ইহাদের সকলেরই মাতৃভাষা বাংলা...সেহেতু রাষ্ট্রভাষা হইবার দাবী সর্বাপেক্ষা প্রবল বাংলা ভাষার।...আমাদের নারীসমাজ সাহিত্যের দিক দিয়া অত্যন্ত পশ্চাদ্‌পদ। উর্দু রাষ্ট্রভাষা হইলে তাঁরা আরও পশ্চাদ্‌পদ হইয়া যাইবেন। অতএব পূর্ব্ব পাকিস্তানে যাতে বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষা রূপে গৃহীত হয়, সেজন্য আমাদের নারী সমাজ সর্বত্র আন্দোলন করিবেন আশা করি। এ বিষয়ে পাকিস্তান গণপরিষদস্থ পূর্ব্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিগণের বিশেষতঃ মহিলা প্রতিনিধির গুরুতর কর্ত্তব্য রহিয়াছে।'[১২]

### *মিল্লাত* পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধ

২৭ জুন কলকাতা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক *মিল্লাত* পত্রিকা ভবিষ্যতের পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় রূপ কেমন হতে পারে তা নিয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। সেখানে উল্লেখ ছিল, 'পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা যে বাংলা ভাষাই হইবে ইহা বলাই বাহুল্য।' নিবন্ধে আরও উল্লেখ ছিল, 'একটা দেশকে পুরোপুরি দাসত্বে রূপান্তরিত করার জন্য সাম্রাজ্যবাদীর যত রকম অস্ত্র আছে তার মধ্যে সবচাইতে ঘৃণ্য ও মারাত্মক অস্ত্র হইতেছে সেই দেশের মাতৃভাষার পরিবর্তে একটি বিদেশীয় ভাষাকে রাষ্ট্রভাষারূপে প্রতিষ্ঠিত করা। মাতৃভাষার পরিবর্তে অন্য কোন ভাষাকে রাষ্ট্রভাষারূপে বরণ করার চাইতে বড় দাসত্ব আর কিছু থাকিতে পারে না। পূর্ব-পাকিস্তানবাসীকে এই ঘৃণ্য দাসত্বের শৃঙ্খলে বাঁধিতে যদি কেহ বাসনা করে তাহা হইলে তাহার সেই উদ্ভট বাসনা বাঙালির প্রবল জনমতের ঝড়ের তোড়ে তৃণখন্ডের মত ভাসিয়া যাইবে।'[১৩]

### *আজাদ* পত্রিকায় ভাষা বিতর্ক

পাকিস্তানের স্বাধীনতার পূর্বেই 'পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা (বিতর্ক)' শিরোনামে *আজাদ* পত্রিকায় দুই দফায় বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ পায়। ১ম দফার প্রবন্ধসমূহ প্রকাশ পায় ৩০ জুন। এ বিষয়ে বশীর আল হেলাল উল্লেখ করেন, 'আমাদের দেখা "আজাদের" প্রাগুক্ত ১ম 'বিতর্কে' তিনটি আলোচনা রয়েছে। এগুলি লিখেছেন নদীয়ার সা'দ আহমদ, সেখ আবদুল হাকিম, কলকাতার ৫/৫ এ বুদ্ধু ওস্তাগার লেনের মহবুব খান। এইসব আলোচনা থেকে প্রভূত উদ্ধৃতি দিতে পারলে আজকের পাঠক আনন্দ পেতেন কিন্তু অত স্থান দেয়া সম্ভব নয়। প্রথম আলোচনাটিই কেবল পুরাদস্তুর উর্দুর পক্ষে। আলোচক বলেছেন, "মাতৃভাষা আর রাষ্ট্রভাষা এক জিনিস নয়, এবং এই বলে শেষ করেছেন, আমাদের খোদা এক, কোরাণ এক, পতাকা এক আর ভাষাই বা কেন এক হবে না।" বাকি আলোচনাগুলোর সবই বাংলার পক্ষে কিন্তু বিভিন্ন বিবেচনার মধ্যে প্রভেদ রয়েছে। ২য় আলোচক বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন।

তৃতীয় আলোচক লিখেছেন : "আমাদের প্রস্তাব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হইবে বাংলা। যদি পশ্চিম পাকিস্তান আমাদের দাবী স্বীকার না করে তবে আমরা জোর করিব না। তাহাদের দেশে তাহাদের ভাষাই রাষ্ট্রভাষা হউক—কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হইবে বাংলা"।'[১৪]

দ্বিতীয় দফার প্রবন্ধগুলো প্রকাশ পায় ২০ জুলাই। সেখানে এ কে সাজেদুল করিম, এ এম খোরশেদ আহমদ ও মোহাম্মদ জহুরুল হকের প্রবন্ধ প্রকাশ পায়। এই তিনজনই বাংলার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। বশীর আল হেলাল উল্লেখ করেন, 'তিনি [এ এম খোরশেদ আহমদ] পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য উর্দু এবং পূর্ব-পাকিস্তানের জন্য বাংলার সুপারিশ করে বলেছেন, কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আর হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাবে যে বাংলা গড়ে উঠেছে তা পূর্ব-পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা বলে গণ্য হতে পারে না, "পূর্ব-পাকিস্তানের জনসাধারণ যে বাংলা জবানে কথা বলে" তাই হবে পূর্ব-পাকিস্তানের "রাষ্ট্রিয় ভাষা" এবং "পৌত্তলিক সভ্যতা নিদর্শনপূর্ণ বাংলা ভাষার হাত থেকে পূর্ব-পাকিস্তানীদের বাঁচিতে হইলে ... সঙ্গে সঙ্গে উর্দুকেও দ্বিতীয় ভাষারূপে স্কুল কলেজে অবশ্য পাঠ্য বিষয় বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। আরবী ভাষা ধর্মীয়ভাষারূপে থাকিবে"। তৃতীয় আলোচক [মোহাম্মদ জহুরুল হক] বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। কিন্তু বলেছেন বাংলাকে রাষ্ট্রভাষারূপে সমগ্র পাকিস্তানের উপরে চাপিয়ে দেয়া উচিৎ হবে না, তাতে পশ্চিম পাকিস্তানের অনুগত ভাষাগুলির বিলুপ্তির আশঙ্কা। "বাংলা ভাষা শুধু পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত। পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারনের জন্য তাদের প্রাদেশিক ভাষাই রাষ্ট্রভাষা হওয়া প্রয়োজন। যেমন পাঠানদের জন্য পশতু, পাঞ্জাবীদের পাঞ্জাবী, সিন্ধুতে সিন্ধি এবং বেলুচীদের জন্য ব্রাহুই ভাষা। ... আন্তর্জাতিক অথবা আন্তপাকিস্তানী ভাষা বর্তমান ইংরেজী ভাষাই থাকা প্রয়োজন"।'[১৫]

### হামিদা সেলিমের চিঠি

বদরুদ্দীন উমরের সূত্রে জানা যায় যে জুলাই মাসে *আজাদ* পত্রিকায় প্রকাশিত বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে কিছু লেখার প্রতিবাদে হামিদা সেলিম (রহমান) 'পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' শিরোনামে একটি চিঠি কলকাতা থেকে প্রকাশিত *স্বাধীনতা* পত্রিকায় প্রকাশ করেন। চিঠিতে উল্লেখ ছিল, 'বাঙালী হিসাবে যেমন আমরা সমগ্র বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের ভিতর দাবী করেছিলাম, তেমনি আজ বাংলাদেশের ভাষা হিসাবেও বাংলা ভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসাবে দাবী করব না কেন? পূর্ব পাকিস্তানের জনপ্রিয় 'আজাদের' পৃষ্ঠায় বাংলা ভাষাকে রাষ্টীয় ভাষায় পরিণত করার বিরুদ্ধে যুক্তি দেখে খুবই দুঃখ হয়। পাকিস্তান জনগনের রাষ্ট্র তাই তার ভাষা হবে জনগনের ভাষা। বাংলার সাড়ে চার কোটি লোক যে ভাষায় কথা বলে, যে ভাষায় সাহিত্য রচনা করে, যে ভাষায় মনের ভাব ব্যক্ত করে সে ভাষা তাদের নিজস্ব ভাষা হবে না এও কি বিশ্বাস করতে হবে? স্বাধীন পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ভাষার সাথে তাদের প্রাণের কোন যোগই থাকবে না, এও কি সত্য হবে?'[১৬]

### গণ আজাদী লীগ

জুলাই মাসে মুসলিম লীগের সঙ্গে থাকা বাম মানসিকতার বেশ কিছু কর্মী কামরুদ্দীন আহমদকে (১৯১২-১৯৮২) আহ্বায়ক করে ঢাকায় 'গণ আজাদী লীগ' নামে একটি ছোট্ট উপদল গঠন করেন। গণ আজাদী লীগের সদস্যদের দৃষ্টিভঙ্গি আংশিকভাবে সমাজতন্ত্র দ্বারা আচ্ছন্ন থাকলেও মুসলিম লীগের চিন্তা-চেতনার প্রভাবই প্রকট ছিল। প্রাথমিকভাবে এই উপদলের সঙ্গে মোহাম্মদ তোয়াহা (১৯২২-১৯৮৭), অলি আহাদ (১৯২৮-২০১২), তাজউদ্দীন আহমদ (১৯২৫-১৯৭৫), তসদ্দুক আহমদ (১৯২৩-২০০১), সৈয়দ মোহাম্মদ আলী (১৯২৮-১৯৯৩) প্রমুখ জড়িত ছিলেন। জিন্দাবাহার প্রথম গলিতে অবস্থিত কামরুদ্দীন আহমদের বাসায় তাদের নিয়মিত সভা অনুষ্ঠিত হতো। গণ আজাদী লীগের প্রতিষ্ঠা বিষয়ে কামরুদ্দীন আহমদ উল্লেখ করেন, '১৯৪৭, জুলাই। মুসলিম লীগে বিশ্বাস করেন না এবং অসাম্প্রদায়িক এ ধরনের কিছু লোকের সমাবেশ আহ্বান করা হয়। তোয়াহা, অলি আহাদ, তাজউদ্দীন, তাসাদ্দুক এবং আমি সেটা আহ্বান করি এবং আমার বাসাতেই তা অনুষ্ঠিত হয়। Peoples Freedom League নামে একটি সংগঠন গঠিত হয় এবং আমি হই তার কনভেনর। একটি ম্যানিফেস্টো ইস্যু করা হয়।'[১৭] পিপলস ফ্রিডম লীগের নাম পরবর্তীতে বদলে গণ আজাদী লীগ করা হয়। এ বিষয়ে তাজউদ্দীন আহমদ বলেন, 'Peoples Freedom league কে anti-fascist Peoples Freedom League এর সাথে যুক্ত করে সরকার পক্ষ থেকে আমাদের নানাভাবে বিরক্ত এবং আমাদের বিরুদ্ধে নানা আইবি তৎপরতা বৃদ্ধি করা হচ্ছিলো। এতে করে আমরা নাম পাল্টে ওটাকে "গণ আজাদী লীগ" নাম দিলাম। প্রথমে ইংরেজীতে একটা ম্যানিফেস্টো জাতীয় জিনিস draft করা হয়েছিলো কিন্তু পরে সেটাকে কিছুটা পরিবর্ধিত করে বাংলাতে